দর্শনে বিমূর্ত বিষয়

মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র

বিমূর্ত বিষয় বলতে সাধারণত এমন একটি বস্তুকে বুঝে থাকি যার কোনো আকার নেই, অবস্থান নেই এবং হয়তো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে যাকে বাঁধা যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে—এ আবার কী রকম বস্তু? বস্তু বলতে তো আমরা বুঝি এমন একটা পদার্থ যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, যার একটি নির্দিষ্ট আকার আছে, যে কোনো না কোনো দেশ বা কালে অবস্থান করে। যেমন, আমার ঘরের সামনে বাঁধা রয়েছে যে গরুটি। এটি একটি বস্তু, যার একটি মূর্তি আছে, বিমূর্ত বা মূর্তিহীন বস্তু আবার কী ধরনের বস্তু? যার আকার আছে, দেশ-কালে অবস্থান আছে তাকেই আমরা জানতে পারি, আর জানা মানেই তো কোনো না কোনো ভাবে তাকে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা। যে সমস্ত বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না, বা যাকে জানবার জন্যে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করি না সে তো কাল্পনিক, কল্পলোকের বস্তু। সেই বস্তুই কি তাহলে বিমূর্ত বস্তু? তা বলা যায় না। কারণ কল্পনার বস্তুও হয়তো মূর্তিহীন নয়; যেমন অর্ধনারীশ্বর যার অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ।

এটি কল্পনার বস্তু হলেও এর একটা মূর্তি আছে। অথবা ধরা যাক পক্ষীরাজ ঘোড়া। তারও তো একটা মূর্তি আছে। তাহলে মূর্তিহীন কল্পনার বস্তু কি হয় না? যদি বা স্বীকার করা যায় যে, মূর্তিহীন কল্পনার বস্তু হয়, তাহলে সেই বস্তুর স্বরূপ কী? তাকে মনের ধারণা ছাড়া আর কিছু কি বলা যায়? সুতরাং তার অস্তিত্ব থাকলেও সে কিন্তু কোনো না কোনো নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বলা যায়, সে সাময়িক বা সময়ের গণ্ডীর মধ্যে অন্তত সীমাবদ্ধ। আর তাহলেই তাকে আর আমাদের অর্থে বিমূর্ত বলা যাবে না। বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে কথাটির অর্থ হল মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব তার আছে। অবশ্য এই অস্তিত্ব, গরুটির যে অস্তিত্ব, বা এমনকি কাল্পনিক বস্তুর যে অস্তিত্ব, তার থেকে পৃথক করতে হবে।

এরকম বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিই সন্দেহ জাগে আমাদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দর্শনে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে আসা হয়েছে। এমনকি এমন কথাও কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন যে, এই বিমূর্ত বস্তুগুলিকে আমরা গরু, ঘট, পট প্রভৃতি আর পাঁচটা অস্তিত্ববান বস্তুর মতো প্রত্যক্ষেই পাই এবং সে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ।

পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে তাকালে বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে আমরা প্রধানত দুটি মত দেখতে পাই। একদল মনে করেন বিমূর্ত বস্তু আছে, অর্থাৎ দেশ-কালের অতীত নিত্য আকারহীন বা মূর্তিহীন বস্তু আছে।[১] একে আমরা ইংরেজিতে অনেক সময় abstract object আখ্যা দিয়ে থাকি। এই মতের পাশাপাশি আর একটি এর ঠিক বিপরীত মতও আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে দেখতে পাই। যেখানে ভাবা হয় যে সমস্ত বস্তুই দেশ অথবা কালের সীমানায় আবদ্ধ এবং তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা যায়। এই বস্তুগুলিকে আমরা ইংরেজিতে concrete object বলে থাকি। প্রথম মতের দার্শনিকগণ মনে করেন জগতে দু ধরনের বস্তুই আছে— যেমন, গরু ঘট, পট প্রভৃতি মূর্ত বস্তু এবং গোত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম, যেগুলি বিমূর্ত বস্তু। দ্বিতীয় ধারায় বিশ্বাসী দার্শনিকগণ কিন্তু গোত্ব প্রভৃতি ধর্মের কোনো নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; অর্থাৎ তাঁদের মতে গরু, ঘট, পট প্রভৃতি মূর্ত বস্তুই জগতে আছে, অন্য কোনোরকম বস্তু জগতে নেই। প্রথম দলের দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিদের নাম করতে হলে আমাদের প্রথমেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নাম মনে পড়ে।

যেহেতু প্লেটোর বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা এই নিবন্ধের মূল বিষয় নয়, তাই বিস্তারিতভাবে সে আলোচনার মধ্যে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দু'একটা কথা বলেই প্লেটোর কথা শেষ করব। আমরা বহু 'ব্যক্তি গরু' প্রত্যক্ষ করি, বহু 'ব্যক্তি ঘট' প্রত্যক্ষ করি। এই ব্যক্তি গরুগুলি বা ব্যক্তি ঘটগুলি কিন্তু প্রত্যেকেই একে অপর থেকে ভিন্ন। তারা যদি প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গরু, ভিন্ন ভিন্ন ঘট হয়, তাহলে এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন নামে না ডেকে আমরা একই নামে ডাকি কেন? নিশ্চয়ই

তাহলে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন গরুর বা ঘটের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার জন্যে প্রত্যেকটিকে আমরা একই নামে ডাকি, অর্থাৎ সেগুলিকে গরু বলি কারণ সেগুলি একটি আদর্শ প্রকৃত গরুর অনুকৃতি মাত্র। যে ঘট জীবনে কখনো দেখিনি, তাকেও আমরা ঘট বলে চিনে নিই, কারণ ঘট মাত্রই তো ঐ আদর্শ ঘটের অনুকরণে তৈরি, এই আদর্শ ঘটের অনুকৃতি যেখানেই দেখব সেটাকেই আমরা ঘট বলে চিনে নেব। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে— আদর্শ গরু বা আদর্শ ঘট কি সত্যিই আমরা ঘট, পটের মতো দেখতে পাই? প্লেটো পরিষ্কার বলেছেন— না দেখতে পাইনা।[২] যা কিছু আমরা দেখি বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি তাকে জ্ঞান বলা যায় না। সত্যিকারের জ্ঞান কখনো এমন বস্তুর হয় না যে বস্তুর ধ্বংস হয়। অনিত্য, আজ আছে কাল নেই, এমন বস্তুর জ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বলা যায় না। আর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা কেবল সেরকম বস্তু সম্বন্ধেই অবহিত হই, যে বস্তু নিত্য, তা দেশ-কালের অতীত, কারণ যা নির্দিষ্ট দেশ-কালে অবস্থান করে তা অনিত্য হতে বাধ্য; তা উৎপন্ন হয়, ধ্বংস হয়। প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় তা-ই হবে যা নিত্য, স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় নিত্য, স্থিত বস্তুর জ্ঞানই যদি প্রকৃত জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান আমরা কখনোই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করতে পারব না। তা জানার জন্য আমাদের জ্ঞানলাভের আর একটি যন্ত্র বা উপায় স্বীকার করতে হয়। যার সাহায্যে এই নিত্য বস্তুকে জানা যেতে পারে প্লেটো তার নাম দিয়েছেন reason বা rational faculty। এই reason-এর বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। অনেকে একে বুদ্ধি বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা আপাতত প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় বা যন্ত্র হিসেবে প্লেটোর reason-কে বুদ্ধি বলেই অনুবাদ করব। এই বুদ্ধির সাহায্যে যা জানি তা কিন্তু আজ আছে কাল নেই এরকম কোনো বস্তু নয়। তা হচ্ছে দেশ-কালের অতীত নিত্য, অখণ্ড পদার্থ। এই নিত্য পদার্থগুলিই বিমূর্ত বস্তু। আদর্শ গো, আদর্শ ঘট, আদর্শ পট প্রভৃতি বস্তুগুলি এরকম বিমূর্ত বস্তু এবং বুদ্ধির সাহায্যে এগুলিকে আমরা জানি। এই বুদ্ধির সাহায্যে জানা বস্তুগুলি কিন্তু আছে, তাদের ধ্বংস নেই, আর তাদের অনুকৃতিই হচ্ছে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তুগুলি। জগতে আজ যদি সমস্ত ঘট ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও কিন্তু ঐ আদর্শ ঘট ধ্বংস হবে না এবং ভবিষ্যতে যদি কখনো কোনো ঘট উৎপন্ন হয়, তাকে ঘট বলা হবে যদি তা ঐ আদর্শ ঘটের অনুকৃতি হয়। কোনো একটি ঘট ঠিক ঘট হয়েছে কিনা বুঝব কোন্ মাপকাঠির সাহায্যে? ঐ মাপকাঠি হচ্ছে আদর্শ ঘটটি। এই আদর্শ ঘটটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, তাকে আমরা কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই জানতে পারি। সুতরাং যে জ্ঞানের বিষয় অতীন্দ্রিয় তাকেই আমরা আছে বলতে পারি, তার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য।

প্লেটোর মতে দু ধরনের জগৎ আছে— একটি সৎ এবং অপরটি তার অবভাসমাত্র। শেষোক্ত জগতের বস্তুগুলি পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আর প্রথমোক্ত জগতের বস্তুগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য অপরিবর্তনীয়, অবিনাশী পদার্থ। প্লেটোর

মতে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য অবিনাশী পদার্থগুলিই প্রকৃত অর্থে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববান, অন্য সমস্ত পদার্থ, অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শময় জগৎ হচ্ছে ঐ সৎ-এর অবভাস মাত্র, ঐ সৎ-এরই অনুকরণে উৎপন্ন।

এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটো শিল্প, সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন তার একটু আভাস এখানে দিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃত সৎ বস্তুর—জগতের অবভাস মাত্র, কিন্তু যেহেতু এই অবভাসিত জগতের বস্তুগুলি প্রকৃত সৎ জগতের বস্তুগুলির সরাসরি অনুকরণে উৎপন্ন, তাই এই জগতের বস্তুগুলি ঐ সৎ বস্তুগুলির অনেক কাছাকাছি বলা যেতে পারে। একজন শিল্পী পরিদৃশ্যমান জগতের অনুকরণে তার শিল্প সৃষ্টি করেন ; একজন কবি অবভাসিত জগতের বস্তুগুলিকে তাঁর 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' অনুকরণ করেন ; তাই শিল্পকর্ম বা কবি সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট কর্ম সৎ জগতের বস্তু থেকে আরও দূরে অবস্থান করে—They are twice removed from reality. সুতরাং শিল্প সৃষ্টি বা সাহিত্য সৃষ্টির আর যা-ই মূল্য থাক না কেন, তারা সৎ বস্তুর অবভাসের অবভাস মাত্র— তাই তারা সত্যের থেকে অনেক দূরে। তাদের জগৎ পুরোপুরি যেন কল্পনার জগৎ, যে কল্পনা আমাদের সত্যে পেঁাছতে দেয় না।

প্লেটোর এই ধরনের মতবাদ অনেকেই হয়তো মেনে নেবেন না। একটি কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। কৃষ্ণদাস সিংহরায় নামে মহাত্মা গান্ধীর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। কৃষ্ণদাসবাবু একদিন আমার কাছে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি আলোচনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষায়— গান্ধীজী যাই বলেন রবীন্দ্রনাথ যুক্তির সাহায্যে তাই খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। শেষকালে গান্ধীজী যখন কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের যুক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না, তখন বললেন—'তুমি কবি, তুমি সত্যদ্রষ্টা, তুমি একদিন আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করবে। যুক্তি দিয়ে সত্যকে জানা যায় না।' এই রকম মতকে যাঁরা সমর্থন করবেন, স্বভাবতই প্লেটোর কথা তাঁরা মেনে নেবেন না।

পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটোর এই ধারাকে অন্যতম প্রধান ধারা আখ্যা দিলে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না। এই ধারার সমস্ত দার্শনিকই মনে করেন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনোই প্রকৃত অর্থে জ্ঞান হতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞান সর্বদাই অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori)। বুদ্ধিগ্রাহ্য একমাত্র এরকম জ্ঞানই নিশ্চয়তা দিতে পারে। এই মতে বিশ্বাসী দার্শনিককে পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত বুদ্ধিবাদী দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আধুনিক দর্শনের পিতা দেকার্তে থেকে আরম্ভ করে কান্ট পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকই একথা মেনে নিয়েছেন। লক, বার্কলে, হিউমের মতো যাঁরা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক তাঁরা যদিও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলেছেন, তথাপি তাঁরা তার সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন— অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনোই নিশ্চয়তা দেয় না। তাই অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের শেষ কথা হল—

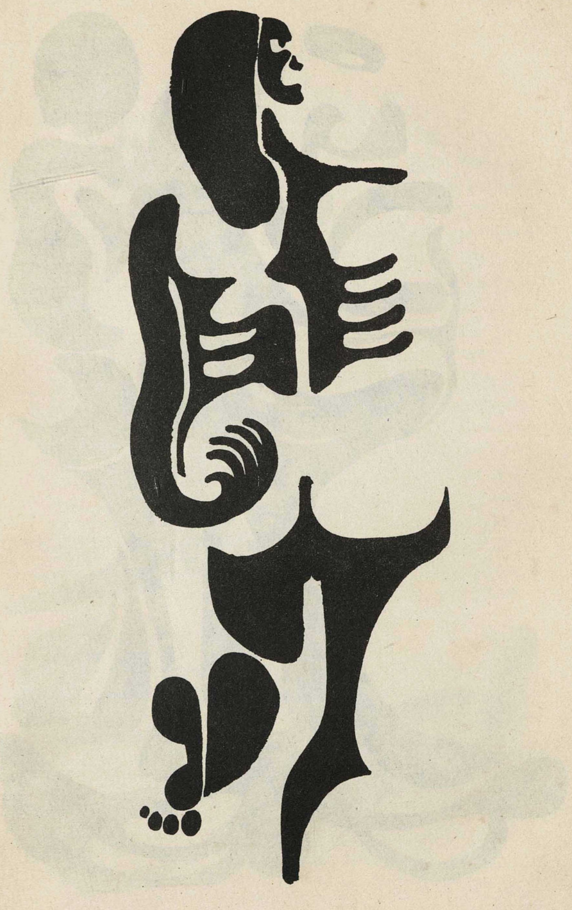

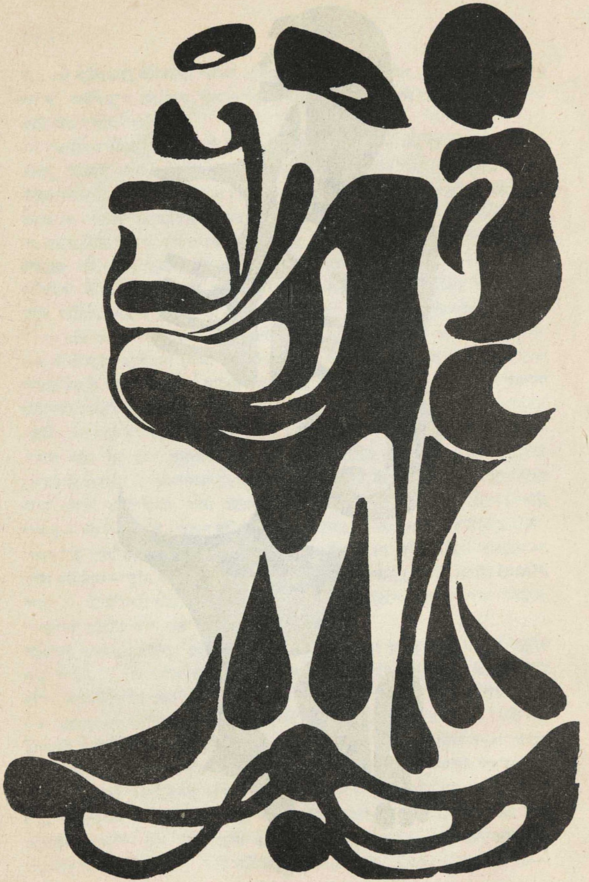

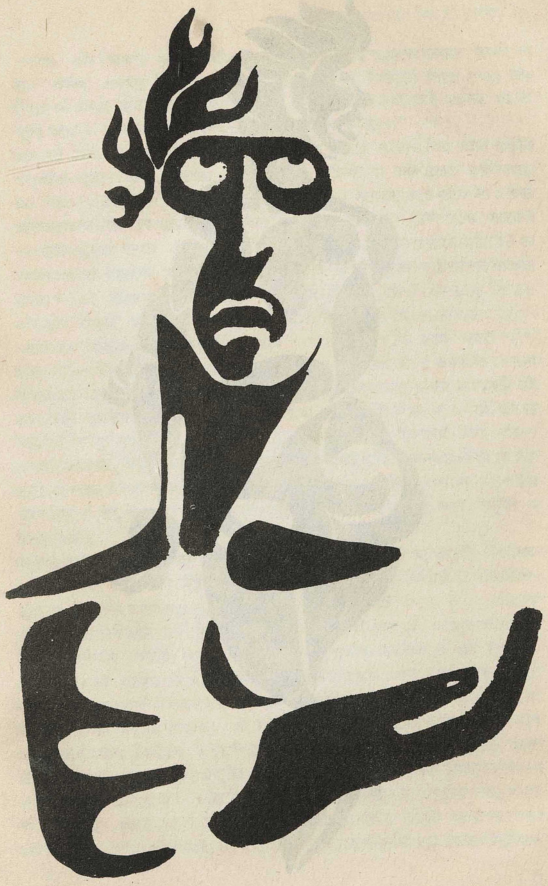

নিশ্চয়তা যদি জ্ঞানের একটি ধর্ম হয় তাহলে বলতে হয় আমাদের কোনো জ্ঞানই হয় না। কারণ, একমাত্র অভিজ্ঞতা-পূর্ব বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানই নিশ্চয়তা দিতে পারে, আর ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞানলাভের যেহেতু কোনো উপায় নেই, তাই জ্ঞানই হয় না প্রকৃত অর্থে। স্বভাবতই এ'রা বিমূর্ত বস্তু স্বীকার করেন না।

অনেকের মতে গাণিতিক বাক্যগুলির জ্ঞান, তর্কবিদ্যার বাক্যগুলির জ্ঞান প্রভৃতি অভিজ্ঞতা-পূর্ব। তাই পাশ্চাত্য দর্শনে ফর্মাল লজিক বা আকারগত তর্কবিদ্যার এত কদর। এই জ্ঞান সর্বদাই নির্ভুল হয়, ভুল হবার সম্ভাবনা এতে থাকে না ; আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনোই ভুল হবার সম্ভাবনা মুক্ত নয়। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সাত আর পাঁচ যোগ করলে যে বারো হয় তা জানবার জন্যে আমাদের সাতটি জিনিস ও পাঁচটি জিনিস যোগ করে দেখার দরকার হয় না। এই সংখ্যাগুলির প্রকৃতি জানলে এবং যোগের ধারণা থাকলেই কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই আমরা বুদ্ধির সাহায্যে বলে দিতে পারি যে এর যোগফল বারো। তেমনি তর্কবিদ্যার একটি বাক্য নেওয়া যাক। 'এখন হয় বৃষ্টি হচ্ছে অথবা বৃষ্টি হচ্ছে না'—এই বাক্যটি সত্য, কিন্তু এর সত্যতা নির্ণয়ের জন্যে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। এটি অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান, কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই এই জ্ঞান হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে যে জ্ঞানই লাভ করি, সেই জ্ঞানের বিষয়টিই বিমূর্ত বস্তু। সুতরাং বিমূর্ত বস্তু শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই জানা যায়—এরকম মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান-এর কদর যে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয় কোনো না কোনো ভাবে বিমূর্ত বস্তু বা অন্ততপক্ষে বিমূর্ত সম্বন্ধ। আর তাই এদের জ্ঞান নির্ভুল ও নিশ্চয়াত্মক।

উপরের আলোচনা থেকে এরকম কারও মনে হতে পারে যে, যাঁরা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক তাঁরাই কেবল আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান (formal logic)-এ বিশ্বাসী। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান-এর কথা স্বীকারই করেন না। এইরকম ভাবনা কিন্তু ঠিক হবে না। বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয়েই আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান স্বীকার করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এই হবে যে, বুদ্ধিবাদীরা ঐ আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিমূর্ত বস্তুগুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান বলবেন, অভিজ্ঞতাবাদীরা তাকে জ্ঞান বলবেন না, কারণ তাঁদের মতে জ্ঞান হতে হলে কোথাও একটা নতুনত্ব দরকার। এই ঘটটি ঘট— কোনো জ্ঞানের উদাহরণ নয়, কারণ এটি নতুন কোনো কিছুকে উপস্থাপিত করছে না। সুতরাং এগুলি প্রকৃত অর্থে জ্ঞান পদবাচ্য নয়, যদিও এগুলি নির্ভুল। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বিমূর্ত বস্তু বলে মন-নিরপেক্ষ কোনো বস্তু আছে তা স্বীকারই করেন না। কিন্তু একথা স্বীকার করতে তাঁদের অনেকের বাধা থাকবে না যে, আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে ব্যক্তিবিশেষকে জানি, তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে

যদি কল্পনায় একে একে বাদ দিয়ে একটি সাধারণ বস্তুতে এসে পৌঁছাই, সেটিকে বিমূর্ত বস্তু বলতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনা-নির্ভর, অর্থাৎ এই বিমূর্ত বস্তুগুলি কাল্পনিক সৎ নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। আমি রাম, শ্যামা, রহিম, আয়েসা প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষকে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্যে জেনেছি। প্রত্যেকের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে আমরা, একজনকে অপর জন থেকে পৃথক করতে পারি। যেমন, আমরা বলতে পারি—রামের পিতামাতা, রহিমের পিতামাতা ভিন্ন, রামের গায়ের রঙ রহিমের গায়ের রঙ থেকে ভিন্ন, রাম যে দেশ-কালে অবস্থান করে, রহিম তা করে না, ইত্যাদি। এই ভেদক ধর্মগুলিকে কল্পনায় বাদ দিলে যে বস্তুটি পড়ে থাকে তা রামও নয়, রহিমও নয়, অথচ রাম রহিম প্রভৃতি সকলের মধ্যে যে সাধারণ ধর্মটি আছে সেটি। একেই আমরা মানুষত্ব বলে থাকি যা সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম হিসেবে থাকে। এই সাধারণ মানুষ বা মানুষত্ব ধর্ম— এরা কেউই কিন্তু বাস্তবের কোনো বস্তু নয় যা রাম, রহিমের মতো দেশ-কালে আছে বলা যায়, এটি একটি চিন্তা বা মন দিয়ে তৈরি বস্তু। একে আমরা ইংরেজিতে অনেক সময় concept বলে থাকি যাকে বাঙলায় প্রত্যয় বা ধারণা বলে অনেক সময় অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এই প্রত্যয় বা ধারণার যেহেতু মন-নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নেই, যেহেতু এই ধারণা আমার মনেরই সৃষ্ট, তাই এগুলিকে বিমূর্ত বলা গেলেও, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতন মন-নিরপেক্ষ বিমূর্ত বস্তু বলা যায় না। অর্থাৎ এই ধারণাগুলি সম্বন্ধে বলা যায় না যে, এরা আগের থেকেই আছে, আমরা কেবল এগুলিকে বুদ্ধি দিয়ে জানি বা আবিষ্কার করি না; বলতে হয় এই ধারণাগুলি আগে থেকে নেই আমরা এগুলিকে সৃষ্টি করি, আবিষ্কার করি না। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে এই বিমূর্ত বস্তুগুলি সামান্যীকরণের সাহায্যে আমরা তৈরি করলেও, এরা অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুরই মনে মনে বা চিন্তার সাহায্যে অমূর্তায়ন বা পৃথকীকরণ। তাই এদের জ্ঞানকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বলা যায় না। কিন্তু, চিন্তার সাহায্যে যেহেতু এগুলি উৎপন্ন অভিজ্ঞতা থেকে যা পাই— তা থেকেই অমূর্তায়নের ফল, তাই এই বস্তুতে জ্ঞানের মধ্যে নতুনত্ব থাকে না, এই জ্ঞানগুলি আমাদের নতুন কোনো খবর দেয় না, আর তার ফলেই একে প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বলা যায় না যদিও এইরকম তথাকথিত জ্ঞান আমাদের নানা কাজে লাগে। বিমূর্ত যুক্তিবিজ্ঞান তাই অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে নতুন কোনো জ্ঞান নয়, আর তাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই নয়— 'ঘটটি ঘট' এই রকম কোনো তথাকথিত জ্ঞান। তথাকথিত জ্ঞানই হোক আর প্রকৃত জ্ঞানই হোক, যেহেতু এগুলি বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা দ্বারা প্রাপ্ত অথবা বুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কৃত জ্ঞান তাই এই জ্ঞানের মধ্যে নিশ্চয়তা থাকবেই। যদি এই বিমূর্ত বস্তুগুলি অভিজ্ঞতায় পেতাম তাহলে আর এক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকত না। এই নিশ্চয়তা কথাটির অর্থ কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তবিক নিশ্চয়তা নয়, এই নিশ্চয়তা কথাটির অর্থ এমন একটি নিশ্চয়তা যা কোনোভাবেই অনিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

দার্শনিকগণ এই ধরনের নিশ্চয়তাকে logical certainty (as opposed to psychological certainty) আখ্যা দিয়ে থাকেন। যে কোনো আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান (formal logic)-এ এইরকম নিশ্চয়তা থাকে। এই রকম বিমূর্ত আকার বা বিমূর্ত সম্বন্ধের উপর যুক্তি বা অনুমান প্রতিষ্ঠিত হলে সেই অনুমান বৈধ হতে বাধ্য, এর অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু এমন কোনো দার্শনিক যদি থাকেন যাঁরা বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন অথচ বলেন বিমূর্ত বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাতেই পাওয়া যায়। তাঁদের মতে formal logic বা আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে কোনোরকম যৌক্তিক নিশ্চয়তা (logical certainty) থাকতে পারবে না। অর্থাৎ সেই যুক্তিবিজ্ঞানের অনুমানগুলি বৈধ হলেও, তাদের সম্বন্ধে একথা বলা যাবে না যে, এগুলি অবৈধ হওয়া অসম্ভব বা যুক্তির দিক থেকে অসম্ভব (logically impossible)।

পাশ্চাত্য দর্শনের যে ধারা নিয়ে এই আলোচনা করছি সেই ধারার কোনো দার্শনিক সম্প্রদায়ই অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিমূর্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা স্বীকার করবেন না[৩], কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের এই ধারার দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব কোনো কোনো ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়, যেমন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিমূর্ত বস্তুর জ্ঞান স্বীকার করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন— এটি ঘট, এটি ঘট বলে যে আমাদের অনুগত প্রতীতি হয়, এই অনুগত প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রত্যেক ঘটের মধ্যে একটি অনুগত ধর্ম স্বীকার করতে হয়। এই অনুগত ধর্মটি ঘটের ক্ষেত্রে ঘটত্ব, গরুর ক্ষেত্রে গোত্ব, পটের ক্ষেত্রে পটত্ব— এই রকম। এই অনুগত ধর্মকে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জাতি বলে অভিহিত করেছেন। এই জাতিগুলির কোনো আকার নেই, যদিও এরা সমস্ত কালে এবং সর্বত্র বিদ্যমান। সমস্ত কালে বিদ্যমান বলার অর্থ হল এই যে, জাতির কোনো উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই— এটি একটি নিত্য পদার্থ। সর্বত্র বিদ্যমান কথাটির অর্থ এই নয়। যে ঘটেও গোত্ব জাতি দেখা যাবে, এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত ঘটের মাধ্যমে ঘটত্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত ঘটেই— ঘটত্ব বিদ্যমান এবং প্রকাশিত। যেমনি গো মাত্রই গোত্ববিশিষ্ট। এই ধর্মটিই গো-কে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করে, তাই একে এক অর্থে ভেদক ধর্মও বলা হয়ে থাকে। ঘট, পট, গরুর পার্থক্য এই যে, ঘটে ঘটত্ব ধর্ম থাকে, পটত্ব বা গোত্ব থাকে না। এই ঘটত্ব ধর্ম থাকার জন্যেই আমরা ঘটকে ঘট বলে থাকি, ঘটকে ঘট বলে চিনে থাকি এবং ঘটকে ঘট বলে জেনে থাকি। এই ঘটত্বের কিন্তু কোনো আকার বা মূর্তি নেই। তাই একে বিমূর্ত বস্তু বলতে কোনো বাধা নেই। এখানে লক্ষণীয় পাশ্চাত্য দর্শনের যে আলোচনা করেছি সেই আলোচনায় বিমূর্ত বস্তুগুলি দেশ-কালের অতীত বলে বুঝেছি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বিমূর্ত বস্তুগুলি দেশ-কালের অতীত নয়, বরং তাদের সর্বকালীন বলাটাই ঠিক হবে। কিন্তু, দেশ-

কালের অতীত বা সর্বকালীন যাই বলি না কেন, দুটি মতেই এই বিমূর্ত বস্তুগুলি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশহীন পদার্থ।

পাশ্চাত্য দর্শনে অনেক সময় ইন্দ্রিয় ছাড়াও বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। বিমূর্ত বস্তুগুলি তাই শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সমস্ত জ্ঞানের মূলেই ইন্দ্রিয় রয়েছে। বুদ্ধিকে তাঁরা জ্ঞানলাভের উপায় হিসেবে বা যন্ত্র হিসেবে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন ঘট, পট, গো-কে যেমন আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানি, ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্বকেও আমরা ঐ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানি। ঘটকে যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি, ঘটত্বকেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রশ্ন উঠতে পারে— ঘটকে তো আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি, ঘটত্বকেও কি আমরা সেইরকম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি? ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় কিন্তু তা-ই বলবেন। কেবল তার সঙ্গে যোগ দেবেন আর দুটি কথা। (১) ঘটের প্রত্যক্ষ আমরা অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জানতে পারি, কিন্তু ঘটত্বের প্রত্যক্ষ অনুব্যবসায়-গম্য নয়। তা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলতে তাঁরা কী বোঝেন সে সম্পর্কে আমি পরে সামান্য কিছু আলোচনা করব। (২) ঘটের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও ঘটের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, ঘটত্বের প্রত্যক্ষে একটি ভিন্ন সম্বন্ধ লাগে।

এসব কথা ভালোভাবে বুঝতে গেলে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা প্রয়োজন। এখানে খুব সংক্ষেপে তাঁদের প্রত্যক্ষ নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হতে চাই। এটুকু আলোচনা না করলে তাঁদের মতটি বোধগম্য হওয়াই কঠিন হবে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে— ইন্দ্রিয় ছ'টি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয় এবং মন হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়। (৪) যে কোনো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধের ফলে যে জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এখানে আরও দু' একটি কথা বলা দরকার। ন্যায়-বৈশেষিক মতে জগতের সমস্ত বস্তুকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারা হচ্ছে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। দ্রব্য আবার নয়টি: ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, দিক্, কাল, আত্মা ও মন। গুণ চব্বিশটি। এই গুণগুলি কখনোই কোনো না কোনো দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না, সমস্ত গুণই কোনো দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না, সমস্ত গুণই কোনো না কোনো দ্রব্যাশ্রিত। এর মধ্যে কোনো কোনো গুণ ঘট, পটের মতো বহির্দ্রব্যে থাকে। যেমন ঘটের রূপ বা রঙ। আবার কিছু কিছু গুণ আত্মারূপ দ্রব্যে থাকে। যেমন, জ্ঞান, ইচ্ছা, সংস্কার প্রভৃতি। এই জ্ঞান আত্মার আগন্তুক ধর্ম বা গুণ। আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান উৎপত্তির জন্যে প্রথমে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ দরকার হয়। আত্ম-মন সংযোগ না হলে কোনো জ্ঞানই উৎপন্ন হবে না। সুতরাং জ্ঞানমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ হচ্ছে আত্ম-মন সংযোগ। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে হলে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ আবশ্যক। আমি যদি আমার সামনে যে ঘটটি রয়েছে

তার দিকে পেছন ফিরে থাকি বা তার সঙ্গে যদি আমার চোখের মিলন না হয় বা ত্বকের স্পর্শ না হয় তাহলে ঘটটির প্রত্যক্ষ হবে না। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ না হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে না। তাই ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদক কারণ বা বিশেষ কারণ বলা হয়ে থাকে। এই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সম্বন্ধ কিন্তু নানারকমের হতে পারে। ঘটের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটের সম্বন্ধ হচ্ছে সংযোগ। সংযোগ সম্বন্ধের অর্থ দৈহিক মিলন বা সংযোগ (physical contact)। দুটি দ্রব্যের মধ্যেই এই সংযোগ সম্বন্ধ থাকতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে— ঘটের যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং ঘটের মধ্যে সর্বদাই একটা ব্যবধান থাকে। এখানে দৈহিক সংযোগ হবার সুযোগ কোথায়, তাহলে তো এক্ষেত্রে দৈহিক সংযোগ ছাড়াই ঘটের প্রত্যক্ষ হয়ে যাচ্ছে না কি? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বলেন— যে চোখকে আমরা দেখতে পাই, যাকে চোখ বলে বুঝি সেটি কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় নয়, সেটি ইন্দ্রিয়-স্থান মাত্র। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজ পরমাণু দিয়ে তৈরি এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থ। তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই তেজ পরমাণু ইন্দ্রিয়-স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ঘটরূপ দ্রব্যের সঙ্গে দৈহিকভাবে সংযুক্ত হয়। এই তেজ পরমাণুও দ্রব্য (পূর্বোক্ত নয়টি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত) এবং ঘটও একটি দ্রব্য, তাই এদের মিলনকে সংযোগ বলা হয়ে থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকেন। সমবায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটি ছোটখাট পুস্তিকার আকার ধারণ করবে। তাই তাঁদের মতে কোন্ কোন্ বিষয়ের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকে তার উল্লেখমাত্র করব। পাঁচ রকমের অযুতসিদ্ধ (inseparable) পদার্থের জুড়ির মধ্যেকার সম্বন্ধকে এঁরা সমবায় সম্বন্ধ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন— (১) দ্রব্য ও গুণ, (২) দ্রব্য ও কর্ম, (৩) দ্রব্য, গুণ কর্ম ব্যক্তি ও তাদের জাতি, (৪) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ, এবং (৫) অবয়ব ও অবয়বী। ঘট ও ঘটত্ব জাতির মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান। ঘটত্বকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটত্বের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে সংযুক্ত-সমবায়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং বিষয় ঘটত্ব ; ঘটত্ব ঘটে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এবং ঘট চক্ষুসংযুক্ত, তাই ঘটত্বের সঙ্গে চক্ষুর সম্বন্ধকে সংযুক্ত সমবায় বলা হয়ে থাকে। ঘটত্ব বিমূর্ত বস্তু, তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানি, তাকে জানবার জন্যে বুদ্ধি ব'লে কোনো নতুন জ্ঞানলাভের উপায় বা যন্ত্রকে স্বীকার করতে হয় না।

ঘটকে যে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু, ঘটত্বকে প্রত্যক্ষ করি— এ আবার কেমন কথা? এর উত্তরে বলা যায়, ঘটকে যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা আমরা আবার অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জানি। ঘটকে জানার পর ঐ ঘটজ্ঞানকে বিষয় করে যখন আমাদের মানস প্রত্যক্ষ হয় সেই প্রত্যক্ষে আমি যে ঘট জানি তা-ও জানি। এইরকম প্রত্যক্ষে মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটজ্ঞানরূপ বিষয়ের সম্বন্ধ হয়।

এইরকম মানস প্রত্যক্ষকেই অনুব্যবসায় বলা হয়। এইভাবে আমরা জানতে পারি যে ঘটজ্ঞান আমার হয়েছে। কিন্তু, এমন জ্ঞানও আমাদের হয় যার অনুব্যবসায় হয় না। এই রকম জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়। ঘটত্বের যে জ্ঞান আমাদের হয় তা নির্বিকল্পক জ্ঞান, তাই ঘটত্বকে যে আমরা প্রত্যক্ষে জেনেছি তা জানতে পারি না। কারণ ঘটত্বের জ্ঞানকে বিষয় করে আমাদের অনুব্যবসায় হয় না। নির্বিকল্পক জ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা না করে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন সেটুকুই বলেছি।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে শুধু ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিই যে বিমূর্ত বস্তু, তা নয়; গুণ, কর্ম, সমবায় অভাব প্রভৃতি আরও অনেক পদার্থকে বিমূর্ত বস্তু বলা যায়, এবং এদের সকলের জ্ঞানই— শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ যেমন বিমূর্ত বস্তুর নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মতে যেমন আগে থেকেই আছে এমন বিমূর্ত বস্তুকে আবিষ্কার করার বা জানার প্রশ্ন ওঠে না, ন্যায়-বৈশেষিক মতে কিন্তু তা নয়। এঁরা বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতোই মনে করেন বিমূর্ত বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে, আমরা কেবল তাকে জানি বা আবিষ্কার করি। কিন্তু, বুদ্ধিবাদীদের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকের পার্থক্য হল তাঁরা মনে করেন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই এই জ্ঞানের উৎস, বুদ্ধি এই জ্ঞানের উৎস নয়। তাই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। আর ফলে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের ধারণা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যখনই নিশ্চয়তার কথা বলা হয় তা যৌক্তিক নিশ্চয়তা নয়, তা হচ্ছে বাস্তবিক নিশ্চয়তা। একই জিনিস একই সঙ্গে সাদা এবং অ-সাদা হতে পারে না, তার কারণ আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি না। অর্থাৎ অচিন্ত্যনীয় বলে আমরা কোনো একটা জিনিসকে একই সঙ্গে সাদা ও অ-সাদা হতে পারে না, তার কারণ আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি না। অর্থাৎ অচিন্ত্যনীয় বলে আমরা কোনো একটা জিনিসকে একই সঙ্গে সাদা ও অ-সাদা বলতে পারি না— এই যে স্ব-বিরোধের নীতি, এটি চিন্তার নিয়ম। বুদ্ধি দিয়েই এটা আমরা বুঝি বা জানি, এই কথাই পাশ্চাত্য দর্শনে বলা থাকে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বলবেন যে, এটি অচিন্ত্যনীয় কারণ আমরা কখনোই এক জিনিসে সাদা এবং অ-সাদা রূপ প্রত্যক্ষ করি না। এটা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করি না বলেই আমরা স্ব-বিরোধ নীতি মানি। এটা অভিজ্ঞতাপূর্ব বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান নয়, এটি অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞান মাত্র।

এতক্ষণ আমরা বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের একটি ধারা এবং ভারতীয় দর্শনের একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। উভয় দর্শনেই অন্য ধারাও আছে। সেই ধারা নিয়ে কোনো আলোচনা করা তো হলই না, এমনকি যে ধারা নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যেও যে কত রকম বৈপরীত্য ও মতবিরোধ আছে তা-ও ভালোভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে যে আলোচনা করেছি তা খুব সাধারণ ও স্থূলভাবেই করেছি, সূক্ষ্মতার দিক থেকে বিচার করলে এর মধ্যেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে হয়তো।

কিন্তু মূল কথাটা যেটা বলতে চেয়েছি সেটিকে ঐ ধারার বক্তব্য বলে সনাক্তকরণ করলে ভুল হবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে দুটি প্রধান মত পাওয়া যায়। একটি মতে বিমূর্ত বস্তুগুলির মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে এবং যা নিত্য, উৎপত্তি-বিনাশহীন পদার্থ। অপর মতে বিমূর্ত বস্তুগুলিকে আমরা পৃথকীকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করি। প্রথম মতটিকে যদি অস্তিত্ববাদ বলি তাহলে দ্বিতীয় মতটিকে সৃষ্টিবাদ বলা যেতে পারে— অর্থাৎ অস্তিত্ববাদে বিমূর্ত বস্তুগুলি আগে থেকেই আছে, সৃষ্টিবাদে বিমূর্ত বস্তুগুলি আগে থেকে নেই, তাকে আমরা পৃথকীকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করে থাকি।

এই দুটি মতবাদ যদি সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি যে কোনো কলার সঙ্গে যুক্ত করি তাহলে ছবিটি কীরকম দাঁড়াবে দেখতে চেষ্টা করা যাক। যাঁরা অস্তিত্ববাদে বিশ্বাস করবেন তাঁরা দু' ধরনের কলার কথা বলতে পারেন। ১: যে কোনো কলাসৃষ্টি হচ্ছে ঐ বিমূর্ত বস্তুর অনুকৃতি মাত্র। প্লেটোর কথা যদি বলি, তাহলে তিনি বলবেন ঘট, পট, মানুষ যেমন আদর্শ ঘট, পট, মানুষের অনুকৃতি, ঘট, পট, মানুষের যখন ছবি আঁকি তখন সেগুলি ঐ অনুকৃতির অনুকৃতি। তাঁদের মতে একটি ছবি ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তার বিচার হবে ছবিটি কতটা সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করা হয়েছে তার উপর। অর্থাৎ যাকে দেখে ছবিটি আঁকা হচ্ছে সেই বস্তুটির সঙ্গে তার কতটা মিল আছে তা দেখে। এসব কথার পূর্বাভাস আমরা আগেই দিয়েছি। ২: প্লেটোর মতো করে যাঁরা ভাবেন না অথচ শাশ্বত, নিত্য, বিমূর্ত বস্তু যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা অনেকে মনে করেন ঐ বিমূর্ত বস্তুই শিল্পের মাপকাঠি। তাঁরা তাঁদের শিল্পে ঐ বিমূর্ত বস্তুরই একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দেবার চেষ্টা করে থাকেন। তাই ঐ শিল্প-সৃষ্টিকে আমরা বিমূর্ত বস্তুর মতন শাশ্বত, নিত্য বলে থাকি। ধ্রুপদী সাহিত্য, ধ্রুপদী সঙ্গীত, ধ্রুপদী চিত্রশিল্প— এ সমস্ত ক্ষেত্রেই যেন ঐ বিমূর্ত শাশ্বত বস্তুকেই ধরবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তাই তাকে এক অর্থে সর্বকালীন বলা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, একটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রখ্যাত সেতার শিল্পী বিলায়েত হোসেন খাঁ-র বাজনা শুনতে গিয়েছিলাম। অসাধারণ বাজালেন এবং সমস্ত দর্শকের করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। উনি তখন খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন— "আমি ঈশ্বরের চাকর মাত্র (তাঁর কাছে ঈশ্বর হচ্ছে বিশুদ্ধ সুর)। ঐ বিশুদ্ধ সুরকে আমি দেখতে পেয়ে তারই প্রকাশ আমার যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে করার চেষ্টা করে থাকি।" তাঁর কথার তাৎপর্য আমি যা বুঝেছিলাম তা হচ্ছে— বিশুদ্ধ সুর যেন কোথাও একটা আগে থেকেই রয়েছে, যা বিমূর্ত, যা শাশ্বত, যা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। তাঁর বাদ্যযন্ত্রে ঐ সুরেরই যেন একটা রূপ ধরা পড়েছে। ঐ বাজনাটি তাই ধ্রুপদী যার উৎকর্ষ সর্বকালীন। যাঁরা ঐ সুরকে সামান্যভাবেও প্রত্যক্ষ করতে পারেন বা অনুভব করতে পারেন তাঁরাই কেবলমাত্র এই বাজনাকে সুন্দর, অসাধারণ বলবেন। যার জ্ঞান

ঐ সুরকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তৈরি করা হয়নি সে হয়তো এর উৎকর্ষ তত ভালোভাবে বুঝতে পারবে না। এই অর্থেই হয়তো মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে সত্যদ্রষ্টা বলে থাকবেন।

যাঁরা অস্তিত্ববাদে বিশ্বাস করেন না, সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে শিল্পসৃষ্টি আগে থেকে অবস্থিত কোনো বিমূর্ত বস্তুকে রূপ দেবার চেষ্টা করা নয়। তাঁরা বিমূর্ত বস্তুকে নিজের কল্পনায় পৃথকীকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করেন। এই পৃথকীকরণের সাহায্যে কল্পনায় সৃষ্ট যে শিল্পকলা তা-ই তাঁদের মতে শিল্পকলা। অস্তিত্ববাদীর ক্ষেত্রে ভালো, মন্দ শিল্পে মানদণ্ডটি যে আগে থেকে রয়েছে, তারই প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম করছেন ; আর সৃষ্টিবাদীর ক্ষেত্রে ঐ ভালো-মন্দর মানদণ্ডটি সে তৈরি করে নিচ্ছে। ঐ তৈরি করা মানদণ্ড, তৈরি হওয়ার পর অনেক সময় শাশ্বত রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ বলবেন, যে সমস্ত তৈরি করা মানদণ্ড শাশ্বত বলে পরিচিত হয় সেগুলি আসলে ঐ আগে থেকে থাকা মানদণ্ডের অনুরূপ বলেই হয়। আর তা না হলে ঐ সৃষ্ট মানদণ্ড সাময়িকই হবে, কোনো নির্দিষ্ট দেশে, নির্দিষ্ট কালের পরিপ্রেক্ষিতেই তার মূল্যায়ন হবে, সেই মূল্যায়ন চিরকালীন বা শাশ্বত হবে না। সেইরকম সৃষ্ট মানদণ্ডে যার বিচার হবে সেই বিচারে কোনো একটি শিল্পসৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট সময়, একটি নির্দিষ্ট যুগে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রশংসা পাবে, সর্বযুগে সর্বকালে প্রশংসা পাবে না। অথবা একই সময় কেউ তাকে উৎকৃষ্ট শিল্প বলে প্রশংসা করবে, অপর কেউ তাকে নিকৃষ্ট শিল্প আখ্যা দেবে।

দর্শনে অস্তিত্ববাদ এবং সৃষ্টিবাদের দ্বন্দ্বকে আমরা ধ্রুববাদ (essentialism) এবং আপেক্ষিকতাবাদের (relativism) দ্বন্দ্ব বলেও হয়তো আখ্যা দিতে পারি।

ধ্রুববাদের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ অনেকদিন থেকেই দানা বেঁধে উঠেছে এবং দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে তার প্রতিফলনও পড়েছে। একদিকে যেমন অস্তিত্ববাদী (existentialist) দার্শনিকগণ ধ্রুববাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, অপরদিকে অতি আধুনিককালে দেরিদা (Derrida) প্রমুখ দার্শনিকগণও ধ্রুববাদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। অন্য কোনো প্রবন্ধে এর বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। □

---

১. এই বস্তুগুলি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অর্থাৎ এদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায় না।

২. তখন আবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে— যদি কখনো তাদের দেখতেই না পাই, তাহলে তারা যে প্রকৃতই আছে তা জানি কীভাবে ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই তো জ্ঞান হতে পারে। অতীন্দ্রিয় পদার্থ অলীক বস্তু, অবাস্তব কল্পনামাত্র। সুতরাং যে জ্ঞানের বিষয় অতীন্দ্রিয় পদার্থ তার আবার জ্ঞান কীভাবে হয় ? এর উত্তরে প্লেটো বলেন—

৩. যদিও কোন্ বস্তুকে বিমূর্ত বস্তু বলব এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্লেটোর মতে আদর্শ ঘট, পট, সৌন্দর্য (beauty), ন্যায়ধর্ম (justice) প্রভৃতি হচ্ছে বিমূর্ত বস্তু, অনেকের মতে আবার ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি হচ্ছে বিমূর্ত বস্তু, যা সমস্ত ব্যক্তি ঘটে, ব্যক্তি পটে থাকে। যদি বিভিন্ন দার্শনিকের বিমূর্ত বস্তুর একটা তালিকা দেওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে যে শুধু প্লেটোর আদর্শ বস্তুগুলি থাকবে তাই নয়, তার মধ্যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম (properties), বিভিন্ন সম্বন্ধ (relations), প্রত্যয় (concept), অপেক্ষক (function), দল বা শ্রেণী (sets or classes) সংখ্যা (numbers) বচন (propositions), নমুনা (types), বিন্দু (points) প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিমূর্ত বস্তু বলতে যাই বুঝি না কেন, পাশ্চাত্য দর্শনের এই ধারায়, কোনো বিমূর্ত বস্তুরই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হতে পারে না।

৪. এই মন কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে Mind বলতে বা বুঝি তা নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের Mind-কে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের আত্মার সঙ্গে তুলনা করা যায়।